



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 404 - 414

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বিদেশিনী’ : সমুদ্র-সংকটের দ্বন্দ্বকথা

ড. সুব্রত কুমার দে

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

নিস্তারিণী কলেজ, পুরুলিয়া

Email ID: subrata.dey86@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Atin
Bandyopadhyay,
Bideshini, Ozalio
de Sumaen,
Suman-Maria,
novel.

Abstract

The unprecedented existential crisis that the undivided Bengal suffered along with the political upheavals and economic debacle during the forties and fifties of the twentieth century did not spare Atin Bandyopadhyay also. Against this backdrop, the litterateur chronicles his first-hand experience of his sea-voyage in his various novels. In 'Bideshini' the warmth of unwavering eternal love stands supreme over the melancholic sailor-life, carnal desire and discrimination on skin- colour.

This novel witnesses how sailors disregard discipline to tinge their otherwise monotonous life and how the perennial tension between the Black and the White goes on. Suman, the protagonist's life turns tragic as he is introduced to Varodi and Maria by his friend Henry as a Spaniard named 'Ozalio de Sumaen'. All these three are white-skinned. The budding love of Suman-Maria stops blooming when Bart William - a local Negro youth-reveals Suman's identity. Suman escapes capital punishment for impersonation by a whisker but loses Maria. However memories continue to unsettle. The narrator envisages love-lorn blonde Maria scouring Bengal for her fiancée. As this love basks in luminous brilliance, the narration juxtaposes the unfulfilled relationship of Sucharu - Liza with the happy conjugal life of Samsad-Selima.

Discussion

বিশ শতকের চার-পাঁচের দশকের সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা, স্বাধীনতা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা - ভারতবর্ষের সাজানো বাগানে এনেছে ভগ্ন জীবনের নগ্ন কথার ইতিহাস। বেঁচে থাকার নিদারুণ যন্ত্রণায় দেশ-দেশান্তরে পারাপার হতে থাকে বাস্তবজীবন জন-সম্প্রদায়। ‘মর্মান্তিক ও পীড়াদায়ক’ হলেও স্বাধীনতার আন্দোলনে মশগুল থাকা মানুষগুলি দেখল স্বজন-হারার বিচ্ছেদ বেদনা ও যন্ত্রণার কাল-প্রকোপ। বিশেষ এই সময়পর্বটিকে নিয়ে অনেক সাহিত্য-সৃজন তাঁদের রচনায় তুলে এনেছেন দেশভাগের যন্ত্রণা, উদ্বাস্তু-জীবনের বেদনার স্বরূপ। প্রফুল্ল রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অমিয়ভূষণ মজুমদার, অমরেন্দ্র ঘোষ তাঁদের কথাসাহিত্যে এই সময়চেতনার সংকটকে আপন আত্ম-সচেতনতার প্রেক্ষিতে তুলে ধরেছেন।

১৯৫০ সালে ‘পূর্বাশা’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘ক্যাপ্টেন কেনেডির গল্প’ কিংবা আন্দামানের প্রেক্ষাপটে লেখা ‘জেগুয়ার’ (দেশ, ১৯৫২) গল্পে সমুদ্রজীবন, বন্দর-প্রান্তরের ইতিকথা তুলে আনেন শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘প্রবাসী আনন্দবাজার’-এর রিভিউ তে লেখা হয় -

“সমুদ্র-কল্লোল ও বন্দর থেকে বন্দরে ফেরার জীবনরহস্যকে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আনার ব্যাপারে তিনিই পথিকৃৎ। যাঁরা ওঁর নানা স্বাদের গ্রন্থ পড়েছেন, তাঁরা জানেন এ বিষয়ে কী অসামান্য ওঁর কলম-ক্ষমতা।”^১

এছাড়াও প্রফুল্ল রায়ের ‘সাগর দোলার ঢেউ’, ‘সিন্ধুপারের পাখি’, কিংবা মনোজ বসুর ‘জলজঙ্গল’ উপন্যাসে সমুদ্র-তীরবর্তী প্রাকৃতিক পরিবেশ উঠে এলেও নাবিকজীবনের কুয়াশাঘেরা জীবনবেদনার কথা প্রথম তুলে আনেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩০-২০১৯)। বিভক্ত বঙ্গ-চেতনায় ব্যক্তি-সংকটের বিরুদ্ধে তিনি পাড়ি জমালেন লবণাক্ত সমুদ্র-জীবনে। সমালোচক সমরেশ মজুমদার যথার্থই বলেছেন, -

“উল্টোরথ পত্রিকার উপন্যাস প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়ে যে তিনিজন লেখক বাংলা সাহিত্যে এসেছিলেন সেই মতী নন্দী, পূর্ণেন্দু পত্রীর পাশাপাশি অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচিত হয়েছিলেন সমুদ্রের গল্প লিখে, জাহাজীদের খালাসীদের কাহিনী পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিয়ে। স্পষ্টতই তাতে চমক ছিল।”^২

ব্যক্তিজীবনে তিনি মনে করেন, সম্মানের সঙ্গে বাঁচার জন্য সকল অভাব-অনটনকে জয় করতে গেলে একমাত্র ভরসা নিরুদ্দীষ্ট জীবনে অতলান্ত সমুদ্রপট। আর সেই ভাবনার কথাই উঠে এসেছে তাঁর ‘সমুদ্রমানুষ’ (১৯৫৮), ‘অলৌকিক জলযান’ (১৯৭৭), ‘সমুদ্রযাত্রা’ (১৯৯৮), ‘সমুদ্রে বুনোফুলের গন্ধ’ (১ম সং. ১৯৯২)-এর মতো উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলিতে। তবে সবিশেষ উল্লেখ্য, ‘বিদেশিনী’ (১৯৬৯) উপন্যাসেও লেখক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার সফরকালীন নাবিকজীবনের নানান বিচিত্র ছবি, বন্দর-প্রান্তরের জনবাসীদের বাস্তব জীবনগাথা লেখনীর নিটোল তুলির টানে তুলে ধরেছেন। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের “উপন্যাস সমগ্র”-এর সপ্তম খণ্ডের ভূমিকায় সমালোচক হীরেন চট্টোপাধ্যায় লেখক অতীনের ‘বিদেশিনী’ ও ‘সমুদ্রযাত্রা’ উপন্যাস দু’টির প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, -

“কিশোর বয়সে প্রথম সমুদ্রযাত্রার অভিজ্ঞতা - অনেকটাই বিষাদ, প্রতি মুহূর্তে বন্দর দেখে পালিয়ে যাবার ইচ্ছা এবং বাড়িতে প্রতীক্ষারত করুণ চোখগুলির কথা মনে পড়ায় ফের নিজেকে সেই দুঃসহ জীবনে গাঁথে নেবার অসহায় কাহিনী একেবারে প্রথম দিকে যে দুটি উপন্যাসে ধরা পড়েছে, সে দুটি উপন্যাস ... ‘বিদেশিনী’ এবং ‘সমুদ্রযাত্রা’।”^৩

উপন্যাসদ্বয়ের নায়ক যৌবন-স্পর্শোন্মুখ কিশোর এবং তাদের পদবিও ‘বন্দ্যোপাধ্যায়’। আত্মজৈবনিক এই উপন্যাস দু’টিতে লেখকের সমুদ্র-সচেতনতা বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। জীবিকার সন্ধানে উদ্বাস্ত-ছিন্নমূল পরিবারের একনিষ্ঠ কর্মী-সদস্যটি কোলবয়ের কাজ নিয়ে ভেসে বেড়িয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন বন্দর-প্রান্তরে। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারেও তিনি উল্লেখ করেছেন তাঁর সমুদ্র-সফরের কথা।

“১৯৫২ সালে আমি জাহাজে চাপলাম। ...আমার তৃতীয় নিরুদ্দেশ যাত্রা হল সমুদ্রে। সিঙল ব্যাংকে উঠে পড়লাম। জাহাজটা কী নিয়ে যাবে, কোথায় যাবে কিছুই জানি না। ...জাহাজটা কয়লায় চলত। আমি জাহাজের কোল বয় হিসাবে কাজ শুরু করলাম।”^৪

উদ্বাস্ত ‘বন্দ্যোপাধ্যায়’ পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান হওয়ার সুবাদে কথাসাহিত্যিক অতীনকে কোলবয়ের কাজ নিয়েই নিত্য-নীরস দৈনন্দিনকতার মধ্যেই শ্রমের পসার সাজিয়ে জীবিকার সন্ধানে বেড়িয়ে পড়তে হয়েছে প্রায় সারা পৃথিবীর জলপথে। আর তা থেকেই ব্যক্তিজীবনে তিনি সংগ্রহ করেছেন অতীব যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বিদেশিনী” উপন্যাসের পৃষ্ঠান্তরে লুকিয়ে থাকা নাবিকদের জাহাজি-জীবনের বিচিত্র সংকট, হতাশা, কর্মহীন অবসাদ-জীবনের কথা ভিন্ন পরিস্থিতির মাঝেও একক সুরে প্রকাশিত। সমুদ্রকেন্দ্রিক তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাসে দেখা যায়, দীর্ঘ

সময় ধরে সমুদ্রযাত্রার মাঝে জাহাজিদের জন্য অপেক্ষা করে অফুরাণ ক্লান্তি, মানসিক অবসাদ। তাই সেই অবসরের অবসাদ কাটাতে আপামর মানুষের আপন জীবনের-জীবিকার তাগিদে কর্মসংস্কৃতির চলমান ধারাকে বয়ে নিয়ে চলে। কখনো ডেক-এ জমে থাকা জল পরিষ্কার, ওয়ারপিন ড্রাম ঘুরিয়ে হাসিল খোলা তার মেরামতি, জানালায় নীল রঙ লাগানো, পোর্ট হালের কাঁচ মোছার পাশাপাশি বন্দর-প্রান্তরগুলোর সবই তো বৈচিত্র্যের একখণ্ড ছবি তুলে ধরেছেন লেখক তাঁর ‘বিদেশিনী’ উপন্যাসে। মিসিসিপির অববাহিকা ধরে জাহাজের এগিয়ে চলা, সেখানকার ছোটো এক বন্দর থেকে তোলা সালফার ও ব্রাজিলের ভিক্টোরিয়া পোর্ট থেকে নেওয়া আকরিক লোহা খালি করে দিগন্ত প্রসারিত সমুদ্র-প্রকৃতিকে পিছনে ফেলে জাহাজিরা এক নির্মল প্রাণের স্পর্শের অপেক্ষায় থাকে। কারণ, তারা মাটির ছোঁয়াচ, নারীর কামজ তারল্যে ও সুরার রসঘন অনুভূতিতে প্রাণ সঁকতে চায়। ক্যারিবিয়ান সমুদ্র ও পোর্ট-অফ-জ্যামাইকা বন্দর পেরিয়ে প্রান্তরবর্তী সবুজ বনানী, পপলার কুঞ্জ ও উইলো বোপাকে পিছনে ফেলে মুহূর্তে স্পষ্ট হয় গাছের ছায়ায় সেখানকার জনবাসীদের লাল-নীল কাঠের ঘর এবং উন্নততর জীবনধারা প্রণালী। লেখক তুলে ধরেছেন তারই এক আলোকিত ছবি,

“কিছু বাস-ট্রাক চোখে পড়ছিল, কিছু মোটর বোট চোখে পড়ছিল এবং ওরা তীরে দাঁড়িয়ে জাহাজ দেখতে দেখতে গল্প করছে। সব কিছুই দ্রুত দুপাশে রেখে জাহাজ ছুটছে। ...যত বন্দরের কাছে এগোচ্ছে তত নাবিকদের উত্তেজনা বাড়ছে। দু পারের গ্রাম মাঠ পাখি দেখে নাবিকেরা উল্লাসে রঙের টব বাজাচ্ছে।”^৫

এককথায়, এক নির্মল প্রাণের ছোঁয়ায় ভরপুর নাবিকি জীবন-স্বচ্ছতার উজ্জ্বল ছবি। সমুদ্রের নোনাভলের ব্যথাতুর অনুভূতিতে বন্দরে দৃশ্য অনেকটাই অবসাদের উপশম হিসেবে কাজ করে। একঘেষেই জীবনযন্ত্রণার মাঝে এও এক অন্যস্বাদের প্রাপ্তি। হোক না নারী, মদ - তবুও তো জীবনের স্বার্থে, রোজগারের স্বার্থে, বেঁচে থাকার স্বার্থে উজ্জীবিত হয় নাবিকদের আপসময় জীবনের আনন্দ।

‘বিদেশিনী’ উপন্যাসের নিবিড় পাঠে দেখি অমানুষিক পরিশ্রমে একঘেষে নাবিকী-জীবনসত্যে নেই কোনো দিবসীয় বৈচিত্র্য। এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে মালবাহক জাহাজিরা একটু মাটির স্পর্শ পেতে শৃঙ্খলিত জীবনে আনে স্বেচ্ছাচারিতার রঙবাহার। পাশাপাশি চলে কৃষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গের বৈচিত্র্যের পারস্পরিক অত্যাচার। উপন্যাসের নায়ক সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্বেতাঙ্গ জাহাজি-ইঞ্জিনিয়ার হেনরি। জাহাজ বন্দর স্পর্শ করলে ঘটনাচক্রে হেনরি-পরিচিত জাহাজে আসা দুই শ্বেতাঙ্গ নারী - ভারোদি ও কন্যা মারিয়ার সঙ্গে সুমনের আলাপ হওয়া এবং হেনরি কর্তৃক সুমনের কৃত্রিম পরিচয়-প্রকাশ স্পেনীয় ‘ওজালিও দ্য সুম্যান’ - আর এই মিথ্যা পরিচয়ের অন্তরালই সুমনের জীবনের এক ট্রাজিক পরিণতির কারণ। প্রাথমিক আলাপচারিতার পর ভারোদির বাড়িতে সুমনের নিমন্ত্রণ হলে মারিয়া ক্রমে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। কাহিনির একদিকে সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত সুমনের উষ্ণ যৌন উন্মাদনা, অন্যদিকে হেনরির সঙ্গে ভারোদির ঘনিষ্ঠ ব্যভিচারী সান্নিধ্য - আর এরই মাঝে চাপা পড়ে আছে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কল্পনাপিয়াসী মারিয়ার এক অদ্ভুত স্বপ্নবিলাস। সুমনের প্রতি মারিয়ার প্রেমজ মোহময়তা বাধা পায় সুমনের মায়ের হঠাৎ মৃত্যুসংবাদে। তবে সকল বাধা অতিক্রম করে মারিয়া-সুমন ঘনিষ্ঠতার দৃশ্যে একদিন অযাচিত ভাবে সুমনের আসল পরিচয়ের এক নির্মম সত্য তুলে ধরে বাট উইলিয়াম নামক এক স্থানীয় নিগ্রো যুবক। একে কৃষ্ণাঙ্গ, সঙ্গে স্পেনীয় নামের মিথ্যা প্রভারণায় সুমনের হত্যা যখন অনিবার্য - তখন কোনো এক অজ্ঞাত কারণে সুমনের সাজানাশ এবং বুকভরা অতৃপ্তির মাঝেই সুমনকে মারিয়ার নজরদৃশ্য থেকে দূরে চলে যেতে হয়, কেবল মনের মধ্যে স্মৃতিমধুর হ’য়ে উজ্জ্বল থাকে মারিয়ার প্রেম। হয়তো আগামীর কালগবাক্ষে সোনালী চুলের মারিয়ার প্রেমবিলাসিনী হয়ে বাংলাদেশের প্রত্যন্তরে ‘সুমন ব্যানার্জী’কে খুঁজে বেড়াবে শাস্ত্র প্রেমের চিরন্তনী সত্তাকে বুকু নিয়ে। আখ্যানে স্থান পেয়েছে সুচারু-লিজার ব্যর্থ প্রেমের যন্ত্রণার অকথিত ইতিকথা এবং সামাদ-সালিমার দাম্পত্যের অমোঘ প্রেমজ আকর্ষণ। এভাবেই ‘বিদেশিনী’ উপন্যাসে নাবিকেরা নিঃসঙ্গ মনের মণিকোঠায় সযত্নে লালন ক’রে চলে সমুদ্রজীবনের স্মৃতিমধুর অতীত জীবনের মন্দমধুর ইতিকথাকে। সেখানে কোনো বর্ণবৈষম্যের ভেদাভেদ নেই, বরং বিচ্ছেদকাতর প্রেমের বিজয় ঘোষণা করা হয়েছে।

‘বিদেশিনী’ এবং ‘সমুদ্রযাত্রা’ – দু’টি উপন্যাসেই লেখক অতীন শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ বিরোধকে স্বতন্ত্র মাত্রায় তুলে এনেছেন। বর্ণবৈষম্যের এই ছবি তাঁর জলজীবন-সমুদ্রযাত্রার দু-একটি উপন্যাসে ধরা পড়েছে। একদিকে দেশভাগের বলি, প্রতি রাতে ‘উদ্বাস্ত’ হওয়ার বেদনা, প্রভূত অভাবের মাঝে আবার জাহাজি-জীবনে কালো চামড়া বা ভারতীয়দের প্রতি বিদ্বেষ ও অবহেলা নায়ক সুমনের পুরনো ক্ষতকে আরও উসকে দিয়ে যায়। তবে জাহাজ মাটি স্পর্শ করলেই জাহাজি মানুষগুলো এক অদম্য বাসনায় ছুটে যায় বন্দরের সুখজ লালিত্য অনুভব করতে। দক্ষিণ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণে যে বন্দরে জাহাজের নোঙর নেমেছিল, সেখানে ভারতীয় জাহাজি নাবিকদের বন্দর স্পর্শ করা নিয়ে কঠোর বিধি-নিষেধ জারি করেছে জাহাজের উচ্চপদস্থ কর্তা ব্যক্তির। হয়তো কালো চামড়ার মানুষদের প্রতি ঘৃণ্য অবহেলা – ভারতীয় বাঙালি জাহাজি নাবিকদের নিরাশ করার পক্ষে যথেষ্ট। জাহাজের পাইলট অফিসারের নির্দেশ মানতে হয় সকল জাহাজবাসীকেই। তিনি আদেশ দেন –

“বন্দরে ভারতীয় নাবিকদের নামতে দেওয়া হবে না। স্থানীয় আইনে এ-বিষয় সম্পর্কে সরল ভাষায় কিছু লেখা নেই অথবা এমনও হতে পারে দাঙ্গা হোক বা না হোক, কালো মানুষের প্রতি অবজ্ঞার হেতুতে কালো মানুষদের জাহাজ থেকে নামতে দেওয়া হবে না।”^৬

এমন বিধি-নিষেধের কারণে বন্দরের জীবন বৈচিত্র্যের সঙ্গে নিজেদের মেলাতে না পারার আত্যন্তিক যন্ত্রণা জাহাজিদের যেন উন্মাদ করে তোলে। লেখক অতীনের ভাষায় তা অনেক প্রাঞ্জল ও ব্যঞ্জিত –

“জাহাজটা বন্দরে বাঁধা থাকবে দিনের পর দিন – ওরা তীর দেখতে পাবে এবং তীরের সব রমণীদের দেখতে পাবে – বাঘের খাবার মতো ওদের চোখ হন্যে হয়ে কেবল যুবতী খুঁজবে অথচ নামতে পারবে না। ...ওরা মাটির স্পর্শ পাবে না – এক অপার তৃষ্ণা এই মাটির জন্য। ওদের চারপাশে পাখিরা থাকবে, ঘাসেরা থাকবে এবং রমণীরা ফুল ফোটার মতো বিচরণ করবে। ওরা জাহাজে কয়েদি পুরুষের মতো পল-দণ্ড-প্রহর এবং দিন-মাস-কাল কাটিয়ে বৃদ্ধ বাঘের মতো নিজের খাবা নিজেই চেটে চেটে সুখ পাবে।”^৭

সকলেই যে দাঙ্গা-কবলিত বন্দরে নামতে পারে না – তা নয়। শ্বেতাঙ্গ মানুষগুলো, বিশেষত জাহাজের চার নম্বর মিস্ত্রি হেনরী বন্দর বা স্থলচর জীবনের মাধুর্য পান করে চলেছে প্রতিনিয়ত। কেবল তাদের প্রতি বাধা-নিষেধ বর্তায় না কোনোভাবেই। বর্ণবৈষম্যের এই নিদারুণ ছবি লেখক তুলে ধরেছেন তাঁর এই উপন্যাসে। তাই কেন্দ্রীয় চরিত্র সুমনেরও চাপা অভিমান প্রকাশ পেয়েছে হেনরীর প্রতি। শ্বেতাঙ্গ হওয়ার কারণে অবাধ স্বাধীনতা লাভের চারিত্রিক ধৃষ্টতায় কোথাও যেন সুমনের সুতীর অভিমানী প্রকাশ, -

“...চারপাশে এত সুখ, আর আমরা রোজ জাহাজের ভিতর কয়েদিদের মতো দিন কাটাব ... তোমরা রোজ বিকেলে বন্দরে নেমে যাবে, রোজ তোমরা ভিন্ন ভিন্ন সুখে মজে থাকবে ... এ আমার ভালো লাগছে না হেনরী।”^৮

জাহাজি-জীবনের সঙ্গে স্থলজীবনের যোগ অনেকটাই বন্ধুর চেতনায় স্পষ্ট। স্থলজীবনের অপেক্ষায় প্রহর গোনা, প্রিয় মানুষটির জন্য অপেক্ষা এবং অপ্রাপ্তি বা হারানোর বেদনা জাহাজিদের ভারাক্রান্ত করে তোলে প্রত্যেক মুহূর্তকে। জাহাজে উঠে কথক-নায়ক সুমন পেয়েছে মাতৃবিয়োগের মতো বেদনা-কণ্টকিত দুঃসংবাদ। জাহাজ কেপটাউনের স্পর্শ পাওয়ার পর থেকেই আবার-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই সুমনকে অকৃত্রিম-আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছে, -

“বড় মালোম থেকে সব অফিসার, সুমনের ছোট্ট ফোকসালে তুকে সমবেদনা জানিয়েছে। অন্যান্য জাহাজিরা ফাঁক পেলেই ওকে সাঙ্ঘনা দেবার জন্য ব্যস্ত থাকত। এবং অন্যমনস্ক রাখার চেষ্টা করত।”^৯

এমনটা না হলে জাহাজিদের প্রাত্যহিক দিনলিপিতে কোথাও যেন ঘাটতি হয়ে যায়, কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটে, মনে হয় অবসন্ন সমুদ্র-সংসার সাজানো-গোছানো হয় না। অফুরান একাকীত্বকে বয়ে বেড়ানোর দুঃসাহস কোনো কালে, কোনো জাহাজির ছিল না, নেই, আর অনাগত ভবিষ্যতেও থাকবে না। তাই সকল বাধা-ব্যবধান অতিক্রম করে দুই বন্ধু – সুমন ও হেনরী ডুবে থাকল উইনচ মেশিনের স্ট্রোপার মেরামতির কাজে। নিঃসঙ্গ জীবনের উৎকৃষ্ট মহৌষধের মতো বেঁচে রইল কাজ,

উপশম হল ধূলি-ধূসরিত একঘেয়ে জীবনের অনেকটা অংশ। আর এরই ফাঁকে উদাসী জাহাজি যুবকদের মতো রেলিং ধরে স্থলজীবনকে দেখার এক অনন্য আনন্দ।

“কেউ হয়তো তীর দেখার সময় ছোটো ছোটো শিশুদের দেখছিল এবং সন্তানের কথা মনে করে প্রিয়জনের কথা মনে করে বিষণ্ণ হচ্ছিল। আর কিছু জাহাজী, এখন ডেকে তাস খেলছে বসে বসে, ওরা তীরে না নেমেও মেয়েদের সম্পর্কে কটুক্তি করে আনন্দ পাচ্ছিল।”^{১০}

পাশাপাশি এক আনন্দ-উচ্ছলতার ছবিও লক্ষ করা যায় সমুদ্র-সফরকারী বিচিত্র মানুষগুলির জীবনে। দুঃখ-ভারাক্রান্ত জীবনকে পরাজিত করে হাসি-ঠাট্টা-কৌতুক-গান-নাচে উত্তাল হয়ে থাকে জাহাজের ডেক-ফোকসালের মানুষগুলি। হয়তো ক্লান্ত পথিকের মতো অনেকটা পথ পেরিয়ে এসে সমুদ্র জাহাজ এক প্রত্যাশা-আকাঙ্ক্ষা-বাসনায় মিলেমিশে একাকার, যেখানে তীরের জন্য, ঘাস-মাটি স্পর্শ পাওয়ার জন্য, শহর-গঞ্জের মাঠ-ঘাট-জনপদবধূদের ছবি ভাষা পেতে চায়। তারই মাঝে ক্লান্ত অবসন্ন শরীরে সমুদ্রের নোনা জলে ভাসমান মানুষগুলি নিঃসঙ্গতার দুর্ভাবনায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। জাহাজি-জীবনের এত চালচিত্রের মাঝেও সদ্য মাতৃহারা মায়ের মুখচ্ছবি সুমনের পিছু ছাড়ে না। রাত্রিকালীন দুঃস্বপ্নে ঘুম ভেঙে তার “আজগুণি স্বপ্ন এবং মায়ের প্রতিবিম্ব সর্বদা স্বপ্নের মতো এক পাশে বসে থাকছে।”^{১১}

হেনরীর সঙ্গে বন্দরে পা রেখে সুমনও খানিকটা বেসামাল মদ্য-মাৎসে। সারেঙ, বড় টিভালেরা, যারা সুমনের প্রাত্যহিক মুহূর্তের শুভাকাঙ্ক্ষী - তারাও সুমনের হঠাৎ নবাবীর মদ্যপ আচরণে আহত। পরিবারজীবনের ক্ষত যেন আরও উন্মত্ত করে তোলে নিঃসঙ্গ নাবিকদের -

“মায়ের মৃত্যু সুমনকে যেন খুব বেপরোয়া করে তুলছে। মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে ওর শেষ ভালোবাসার আশ্রয়টুকু গেছে। বন্দরের কোন সুখকেই সে এখন ছেড়ে দিতে চাইছে না।”^{১২}

এভাবে সুমনের মতো জাহাজিরা সমুদ্রের নোনা জলে গড়ে তোলে দুঃখের ইমারত। পরিবার থেকে অনেকটা দূরে অভিভাবকহীন জগৎ-সংসারে তার একাকীত্বের হাহাকার বড়ো করণ সুরে বেজে ওঠে। তখন হারিয়ে যায় তার স্বপ্নের সাজানো সাঁঝবাতির রূপকথারা।

অবসর সময়ে, অবসর দিনে বা ছুটির দিনে জাহাজি মানুষগুলির চালচিত্রও উঠে এসেছে “বিদেশিনী” উপন্যাসে। মনের মতো মানুষগুলিকে নিয়ে জাহাজের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কোনো কোনো নাবিক তার প্রথম সফরের গল্পকথা কিংবা অশ্লীলতার নামাবলী গায়ে চাপিয়ে তগু কামনার পরিতৃপ্তির আলাপ-আলোচনায় মেতে থাকে। জলজীবনের এক ভয়ংকর তৃষ্ণা এই মাটির জন্য, উদ্ভিজ্জ প্রাণের প্রতি। একঘেয়ে দীর্ঘ জাহাজি-জীবনে রোমাঞ্চকর ঘটনার স্মৃতি থেকে কোনো কোনো জাহাজি তুলে আনত রঙ-বেরঙের দ্বীপ ও তার বিচিত্র মেয়েমানুষগুলোর কথা। দক্ষিণ সমুদ্রে, ট্যারিয়ান্ট আয়র্ল্যান্ডের অসভ্য দেহ-কামজীবনীদেবী পোশাক নারীসঙ্গ বিবর্জিত সমুদ্র-জাহাজিদের মনের কামনায় রসদ মেটাতে সুপটু। তবু সারা সফর ধরে সংযত-নির্বাক বৃদ্ধ কাণ্ডান ও স্মৃতিপট থেকে তুলে শোনাতে তাঁর সমুদ্র ও বন্দর-জীবনের নানান ইতিকথা। অপারিসীম বেদনাতার বুকে নিয়ে ট্রাজিক নায়কের মতো তিনিও সাক্ষ্য হয়ে থাকলেন তারই সৃষ্ট এক অস্পষ্ট ইতিহাসের অধ্যায় হয়ে।

অশ্লীল জীবনাচরণের জন্য কাণ্ডান-সারেঙসহ উচ্চপদস্থ কর্তব্যাক্তিরা কঠোর অনুশাসনে রাখে জাহাজিদের। লগ বুক-এ নাম তুলে বিরাগভাজন হতে চাইত না প্রায় অনেক জাহাজিই। তাই যতই স্বৈচ্ছাচারী আচরণ করুক না কেন অশনি সংকেতের ভয় পিছু ছাড়ত না তাদের। সুচারু কিংবা সুমনের তুলনায় তেইশ টাকা মাইনের জাহাজি কর্মী, সুমনের ডেকবন্ধু সামাদ একটু বেশিই অস্থির অশ্লীল প্রকৃতির যুবক। দীর্ঘ সমুদ্র সফরে তার প্রাত্যহিক দিনলিপিতে থাকে যৌনতার লোলুপ আকাঙ্ক্ষা। নারী-নগ্নতার ছবি দেখা থেকে শুরু করে সমুদ্রবন্দরে আতপ্ত নারীসঙ্গ কামনায় মশগুল হয়ে থাকে সর্বদা।

উপন্যাস-চৌহদ্দির একটি ঘটনায় দেখা যায়, ভিক্টোরিয়া বন্দর সংলগ্ন একটি ব্রিজে এক অন্ধ তরুণী মেয়ে ক্ষুণ্ণবৃত্তি করে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করত। গায়ে তার ভদ্র-শালীন পোশাক, ঠোঁট পুরু, নিখোঁদের মতো চুলের সেই মেয়েটির গায়ের রং তামাটে। বন্ধু সামাদকে নিয়ে সুচারু প্রতিদিন রাতে শহর পরিক্রমায় বেরোলে তাকে সামর্থ্য অনুযায়ী ভিক্ষা দিত। একদিন সুযোগ বুঝে সামাদ ওই মেয়েটির উপর শারীরিক যৌন নির্যাতন চালায়। নির্বাক অশ্রুপ্লাবনে মেয়েটির

সেদিনকার আত্ননাদ সুচারু ভুলতে পারেনি। আর এই নিয়েই সামাদের সঙ্গে তৈরি হয়েছে বেশ খানিকটা মানসিক দূরত্ব। তবু চারিত্রিক স্থূলতার পরিবর্তন হয়নি। ভারোদীর মেয়ে মারিয়াকে দেখে সুমনের উদ্দেশ্যে করা উক্তি, “মাগীর দেমাক তোমাকে ভেঙে আসতে হবে” - সামাদ চরিত্রের অপরিণামবর্তিতার আর এক নিদর্শনবহ।^{১০}

আসলে দীর্ঘ সমুদ্রতরঙ্গ দেখে দেখে জাহাজি মানুষগুলির একঘেয়ে জীবনে বৈপরীত্য আসে না, বরং গ্রাস করে এক ভয়ংকর ক্লাস্তি। আবার ধর্মভীরু বড়ো টিভালের বালিশের তলায় যুবতী নারীর উলঙ্গ ছবি রেখে সামাদ যে তার চারিত্রিক লঘুতার পরিচয় দিয়েছে, তাতেও ক্লাস্তিকর সমুদ্রযাত্রার অসহায় মুহূর্তের চিত্র উঠে আসে। শালীনতার মাত্রা হারিয়ে সামাদ যখন বড়ো টিভালকে উদ্দেশ্য করে বলে -

“শালা আমাকে বলে দোবাকের পয়দিশ, শালা তুই কি রে! আমি ন্যাংটো মেয়ের ছবি দেখি, একশ বার দেখবো। আমার সালিমা ওটা জানে। তুই তো সফরে, তোর বিবি অন্যের সঙ্গে র্যালা দেবে ভেবে তালক দিস। কচি মেয়ের যান লিস। লতুন লতুন তোর ফুল চাই।”^{১১}

তখন, নিঃসঙ্গ নাবিকদের ব্যক্তিসংকটের তীব্র জ্বালা মুহূর্তেই প্রতীয়মান হয়ে ওঠে কালো কালো অঙ্গারে আঁকা পৃষ্ঠাগুলিতে।

সমুদ্র-জাহাজি মানুষগুলির জীবনে আশ্চর্য এক ট্রাজিক বেদনা কাজ করে। বিবাহিতা স্ত্রীদের বাড়িতে রেখে এসে দীর্ঘ সমুদ্রসফর তাদের জীবন থেকে কোথায় যেন পারিবারিক সম্পর্কে একদিকে যেমন ধূলিমলিন করে দেয়, নগ্ন রসরঙ্গে মেতে থাকে একাকী সমুদ্র-জীবনে, তেমনই সেভাবেই জাহাজি-জীবনের প্রত্যেকটা দিনও সামাদদের ভালোই কেটে যায়, রাত্রিকালীন কামজ স্বপ্নগুলো যেন আরও ভালো হয়; আর সে কারণেই সালিমাদের মতো আত্মবিসর্জিতা স্ত্রীদের চোখের জল নীরবে বয়ে চলে। অন্যদিকে প্রেমের সুগভীর টানও বজায় থাকে তাদের মধ্যে। জাহাজের স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাচারী জীবনকে চোখের সামনে দেখে শরীরবৃত্তীয় লালসা বলসে উঠলেও আপন স্ত্রীদের প্রতি প্রদর্শিত হয় সুগভীর আনুগত্য, ভালোবাসা, মমতা-মধুর আবেগ, শোভিত থাকে এক সুবাসিত ভালোবাসা।

সমুদ্র-জীবনের দীর্ঘ অবসরের মাঝেও জাহাজ যখন বন্দরে নোঙর ফেলে তখন ডেক-জাহাজিদের ব্যস্ততা এবং পরিশ্রমের অন্ত থাকে না। সারি-সারি ট্রাকে সালফার বোঝাই, জাহাজে মাল তুলে খালি ট্রাক নিয়ে মালবাহকদের নিরুৎসাহে চলে যাওয়ার মাঝে একঘেয়েমি জীবনাচরণের ছবি প্রতীকায়িত হয়ে ওঠে। অবসর মুহূর্তগুলি অতিবাহন করতে পরিবার-জীবনের স্মৃতিকথা, শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ বিরোধ, দাস ব্যবসার কলুষতার ছবি, এবং বন্দর-জীবনে উচ্ছলতার পাশাপাশি নিত্য-নৈমিত্তিক ইঞ্জিন মেরামতের কাজ। বয়লারে কয়লা দেওয়া তো থাকতই, তারই মধ্যে চলত বিচিত্র কাহিনি-কথনের কল্পিত বাহার।

আরেকটি বিষয় সমুদ্র-জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেটি হ'ল সমুদ্র-পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বা সমুদ্র-তীরবর্তী কুলে ঝিরঝিরে বৃষ্টি তো প্রায়-আবশ্যিক এক ব্যাপার। সঙ্গে চারদিক কুয়াশার সাদাটে আস্তরণে পরিব্যাপ্ত। কিন্তু শৈতপ্রবাহের অবিরল বেগ জাহাজিদের জীবনকে স্থবির করতে পারে না। তাই বর্ষার পোশাক পরেই ডেক রেলিঙে বন্দর-জীবনের স্পর্শিত ঘ্রাণ নিতে থাকে জাহাজিরা। যে কোনো অজুহাতের সূত্র ধরে বন্দর ছুঁতে পারলেই তারা খুশি। নেশাখোর জাহাজিরা এমন বর্ষা-মধুর দিনে ডেক-এর উপরে বসে তামাক টানে আর দেশে ফেলে আসা বর্ষার অতীত দিনগুলোর স্মৃতিতে মশগুল হয়ে থাকে। তবু হেনরীর মত জাহাজিরা বোঝে -

“জাহাজী জীবনে বড় একঘেয়েমি থাকে।”^{১২}

পরিবারের অতীত স্মৃতি সমুদ্র-সফরের দিনগুলোতে আলোকদীপ্ত ভাষা পেতে চায়। অবসৃত কর্মযজ্ঞের বিষন্ন বেদনাতটে কোনো কোনো নাবিকের চেতনায় উজ্জ্বল হয় বিচ্ছেদের কাতর আকৃতি। কোনো নাবিক যখন পরিবার থেকে শেষ শুভেচ্ছা-আশিসটুকু নিয়ে সমুদ্রের নোনা জলে ভেসে যায় - করুণ সেই অনুভবটুকু তাদের মানসপটে বহুদিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে থাকে। পরিবার থেকে বিদায়ের মাহেন্দ্রক্ষণে সমুদ্র-নাবিক সুমনের মানসপটে বিচ্ছেদের যে নিদারুণ আকৃতির প্রকাশ দেখি, তাতে বাঙালির নিভৃত গৃহকোণের সুখজ স্মৃতিকে সততই উসকে দিয়ে যায়। দীর্ঘ প্রবাসী-জীবনের এই কাতর অনুভূতিটুকুর প্রকাশ লেখক খুব সুন্দরভাবেই ব্যক্ত করেছেন আলোচ্য উপন্যাসে -

“...এক হতবুদ্ধিসম্পন্ন যুবক - সে আকাশের দিকে নিজে দুটো হাত প্রসারিত করে দিল এবং আবেগে বলে উঠল, মা ... আমার মাগো। শৈশবের কিছু স্মৃতি, দাঙ্গা এবং মৃত এক পুরুষের ছবি অথবা সেই মুসলমান যুবক, মায়ের লাঞ্ছিত মুখ ... আর কি যেন ... কি যেন, সে ডেকের উপর দাঁড়িয়ে হাওয়ার ভিতর হাতড়াতে থাকল। ... মা ... মাগো, সে ফের বসল। মায়ের কাছে বিদায়ের সময়টুকু বড় করণ। মা দুঃখ করছিলেন, সুমন আমি একা একা কি করে থাকব। মায়ের সেই করণ স্মৃতি মায়ের সহসা মৃত্যু সুমনকে বড় বেশি কাতর করেছে।”^{১৬}

পরিবার-জীবনের স্মৃতি, ফেলে আসা অতীত, সবান্ধবজনের ঘেরাটোপে দাঁড়িয়ে নাবিকেরা জীবন-জিজ্ঞাসার অনুসন্ধান করে চলে গভীর প্রত্যয়ে। সুমনও তার ব্যতিক্রম নয়। ভাঙাচোরা মন নিয়ে সে সুখজ স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরেই বেঁচে থাকতে চায় সুগভীর নিঃশ্বাসে। আবার বহুধা সত্তা নিয়ে জাহাজে ভেসে চলা নাবিকদের আচরণগত অস্থিরতার মধ্যে কোথাও অনুভূতির কোমল স্পর্শটুকু মন ছুঁয়ে যায়। এভাবেই জাহাজি-জীবনের ইতিবৃত্ত রচিত হয় কালের কপোলতলে, যেখানে শত হিংসা-দ্বন্দ্ব-অশান্তি-অস্থিরতার মাঝেও কাজ করে চলে নাবিকি-মনের সুতীক্ষ্ণ অনুরণন।

একদিকে মারিয়ার সরল ও অকৃপণ ভালোবাসা, আর অন্যদিকে মাতৃম্লেহের দু'কুলপ্লাবী উচ্ছ্বাস - এ দু'য়ের সম্মিলনে নাবিকের জীবনসত্যে আসে দ্বন্দ্বমধুর জ্যোৎস্নার বিকিরণ। ব্যক্তি-আবেগের টানাপোড়েনে অতীতের স্মৃতি-মধুর সম্পর্কের সঙ্গে বর্তমানের মেলবন্ধন বেশ প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে। পাশাপাশি দেখা যায়, নাবিক-জীবনে ঘটে যাওয়া এমন কিছু সত্য ঘটনা - যা একদা এক-একটি ইতিহাস রচনা করেছে। কত বিচিত্র স্বাদের জীবনভাবনা, সম্পর্ক-সূত্রের উত্থান-পতন, আত্মানুসন্ধানের রসায়নে নাবিকের মর্মসত্যেও কোথাও ধাক্কা দিয়ে যায় অকপট সত্যময়তা। বন্দরে-বন্দরে নতুন মেয়ের অনুসন্ধান, সোঁদা মাটির গন্ধে মশগুল হয়ে থাকা নাবিকের জীবন-দর্শন স্বতন্ত্র স্রোতে প্রবাহিত হয়ে যায়।

‘বিদেশিনী’ উপন্যাসে সুমন অকপটে স্বীকার করে নিয়েছে কোমল-শরীরী সদ্যযৌবনবতী মারিয়ার কামজ স্পর্শ। হেনরীদের মতো নাবিক-জীবনে তা নিতান্তই খুব একটা নতুন খবর নয়। কারণ, জাহাজি-জীবনের সত্য রচিত হয় দৈনন্দিন কর্মের ঘটনাসূত্রে এবং সৃষ্ট দর্শনের অমোঘ আকর্ষণে - নারী-চেতনাই সে জীবনের মূল কথা। তাই হেনরী ঈষৎ আফসোসের সুরে বলে ওঠে, -

“নাবিক জীবনে এটাই বড় দৈব! কথা নেই, বার্তা নেই, বন্দরে এক সুন্দরী বালিকা অথবা যুবতীর সঙ্গে এক আকস্মিক আলাপ। তুমি নাবিক বলেই সে আলাপ করবে। ঘরে নিয়ে যাবে, সমুদ্রের এবং দ্বীপের গল্প শুনতে শুনতে তোমাকে একসময় ভালোবেসে ফেলবে। আমরা নাবিকরা তখন মিথ্যা প্রেমের জন্য এবং অহমিকার জন্য বানিয়ে বানিয়ে কত বিচিত্র সব গল্প বলি। সেসব সত্য ভেবে একদিন বলবে, তুমি থেকে যাও, তোমাকে ঘর দেব থাকার, জল দেব খেতে - আর সব ভালোবাসা আমার অঞ্জলিতে তোমার জন্য তুলে রাখব।”^{১৭}

অর্থাৎ জাহাজের নাবিকদের প্রতি যেন এক ধরনের মায়ামোহ-মমতা সর্বদা ক্রিয়াশীল থাকে বন্দর-শহরের মানুষগুলোর। শিকড়ের আত্মজ টানে তারা আপন করতে নিরুদ্বিগ্ন। তাই আতিথ্যের পথ্যপ্রদান থেকে আপন হতে তাদের বেশি সময় ব্যয় করতে হয় না। কিন্তু এ সবই জলস্রোতের মতো; কালের সুকোমল হাত ধরে অজান্তেই সেই আবেগ পরিবর্তিত হয়ে যাবে। জাহাজিদের কাছে এও এক চিরন্তন নিয়তি।

দীর্ঘ সমুদ্রের প্রবাস-জীবন জাহাজি মানুষকে বড় অশান্ত অস্থির ও একঘেয়ে করে তোলে - সে কথা লেখক অতীনের তাঁর সমুদ্রকেন্দ্রিক বিভিন্ন উপন্যাসে এক প্রধান বিশিষ্টতার দাবি রাখে। সেখানে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বপট স্পষ্ট হয়ে ওঠে, হারিয়ে যায় আন্তরিকতার মধুর আবেগ। সন্দেহ-সংশয়-অবিশ্বাসে ভরা এই দিনগুলোতে জাহাজের প্রায় প্রত্যেকটা মানুষ আত্মপ্রচার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার লোভে লালায়িত হতে থাকে।

জাহাজি সামাদ দীর্ঘ সমুদ্র-জীবনে স্ত্রী সালিমাকে ছেড়ে খানিকটা হতাশ, একাকীত্বের মানসিক ব্যাধিতে অনেকটা পঙ্গু; তাই কখনও কখনও বড়ো টিভাল রহমানকে চারিত্রিক দোষে দুষ্ট করে ভাবীকল্পনায় সামাদ তার শরীরী ক্ষমতা প্রদর্শন করতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। কারণ, কূটকৌশলী রহমান হয়তো সালিমাদের মনকে বিষময় করে তুলছে সামাদের প্রতি -

এমনই সব অলীক ভাবনা সামাদের, সেই সঙ্গে সালিমার ‘খৎ’ (চিঠি) না আসার বিষয়টি সামাদের মানসিক অসহায়তার ক্ষেত্রকে আরও বেশি প্রকট করে তোলে। অথচ এই সকল মানুষগুলোর ম্রিয়মান অতীতকে স্বর্ণোদ্ধৃত করে রাখে ‘বিদেশিনী’ উপন্যাসের চলমান জাহাজ আর সফেন জলতরঙ্গ -

“জাহাজ তখন সমুদ্রে। ভিক্টোরিয়া বন্দর থেকে জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে। জাহাজ যাবে কার্ডিফে। আকরিক লৌহ নিয়ে জাহাজ বেশ চলছে। ক্রমশ উত্তরের দিকে জাহাজ উঠে যাচ্ছিল। নীল দরিয়া ধরে ক্রমে উত্তর থেকে দক্ষিণে, দক্ষিণ থেকে পূবে অথবা পশ্চিমে ... সামাদের সেই থেকে আতঙ্ক। বিবির খত এল না।”^{১৮}

তাই নিজের রোষ মেটাতে রহমানকে বোটের কিনারায় নিয়ে গিয়ে আপন রুদ্রদাপট ও শরীরী ক্ষমতা প্রদর্শন করতেও পিছুপা হয় না। সংশয় সন্দেহের পাশাপাশি জাহাজিরা তাদের প্রত্যক্ষ বাস্তবে দেখা ঘটনা থেকে কল্পসিদ্ধ নানান কাহিনীর জন্ম দিতে পারে মুহূর্তের মধ্যেই। তাই কল্পপ্রবণ মানুষ সুমনের কাছে নানান বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে মারিয়া তার স্মৃতিটুকু সুধাপূর্ণ করে রাখতে চায়।

“সুমন এক নাবিক, সারা পৃথিবীর সব বন্দরের ছবি ওর নখদর্পণে এবং এই সুমন পৃথিবীর যাবতীয় খবর নিয়ে এসেছে মারিয়া নামক এক বালিকার জন্য।”^{১৯}

এ সবকিছুই যেন লেখকের ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে প্রকট হয়েছে তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টিতে; অন্যান্য উপন্যাসের মতো ‘বিদেশিনী’ উপন্যাস তার ব্যতিক্রম নয়। ‘গল্পসরণি’তে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে তিনি অকপটে বলে গেছেন সেই বিচিত্র অনুভব-অভিজ্ঞতার কথা, -

“জাহাজে সারা পৃথিবীটা ঘুরে এসে আমার মনে হয়েছিল - পৃথিবীটা এত বড়ো!”^{২০}

উল্লেখ্য, দীর্ঘ সমুদ্র-সফর অনেক জাহাজিকেই কল্পনাপ্রবণ মনস্কতায় উন্নীত করে, আর সেই কল্পনাপ্রসারী মন নিয়ে অনেক জাহাজিই বিচিত্র প্রসঙ্গ উত্থাপনের মধ্যে দিয়ে সৃজনমুখী প্রতিভার আত্মবিকাশ ঘটাতে পারে। সুমনও তার ব্যতিক্রম নয়। তার সৃষ্টির রসমাধুর্যে মারিয়া যারপরনাই খুশি ও আপ্লুত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পাখির গল্প শুনতে তাই মারিয়া নিজেকে উজার করে দেয় - তা সে উটপাখির গল্পই হোক কিংবা দক্ষিণাঞ্চলে বসবাসকারী ‘সান’ নামক আশ্চর্য পাখির কথাই হোক। আসল কথা কোনো বিষয়কে নিয়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে জাহাজিদের ডুবে থাকতে হয়, বাঁচতে হয় বর্তমানের প্রতি মুহূর্তকে সঙ্গী করে; নইলে অতীতে ফেলে আসা নানান অনুষ্ণের হাত ধরে তারা অস্থির হয়ে উঠবে, মনও বেদনা ভারাতুর হয়ে প্রিয়জনের সান্নিধ্য কামনা করবে এবং সেই না পাওয়ার থেকে ঘনীভূত হতশায় তারা প্রতিনিয়ত জীর্ণ হতে থাকবে। তাই কল্পনার জারক রসে সামান্য বিষয়কেও ব্যঞ্জনার অতিরেকে সাজিয়ে নিতে হয় জাহাজি-নাবিকদের।

কোনো সূত্র বা প্রসঙ্গের অবতারণা ঘটিয়ে জাহাজি মানুষগুলো দীর্ঘ একাকীত্বের অবসাদে জর্জরিত হয়ে একে-অপরের বিরুদ্ধে খড়াহস্ত হয়। প্রবল প্রতাপাশ্রিত শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে অতীতের ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনায় প্রতিহিংসার আগুন জ্বালিয়ে তোলে নিজের মনের মধ্যে। একে সমুদ্র-নাবিক মানুষগুলি পরিবার-পরিজন বিচ্ছিন্ন হয়ে নিরানন্দের তীব্র মানসিক ব্যাধিতে ভুগতে থাকে, তাই সমুদ্রের লবণাক্ত স্বাদ পারে না সে ব্যাধিতে উপশমের প্রলেপ লাগাতে। শরীরী ক্ষমতায় সামাদ অসমর্থ নয়, তারুণ্যের তেজ ও দৈহিক শক্তির পরিচয় পাঠক উপলব্ধি করে জাহাজের ডেক-এ তার কাজ করার সুবাদে ও রহমানের কারণে প্রতিহিংসার আগুনে পুড়তে দেখে।

যৌবনদীপ্তির তেজের সঙ্গে সালিমার প্রতি রয়েছে সামাদের অগাধ ভালোবাসা ও বিশ্বাস। কিন্তু সালিমার গ্রামের প্রতিবেশী টিমাল রহমানকে সে সন্দেহ করে। কারণ রহমানের কূটকৌশলী আচরণ এবং সর্বগ্রাসী-অর্থলিপ্সু-চরিত্রহীন আচরণকে সামাদ ভয়ের পাশাপাশি যথেষ্ট ঘৃণাও করে।

একবার এক ঘটনায় লক্ষ করা যায়, সামাদের বেশ কিছু অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়লে রহমান তার যোগান দেয় এবং সাদা পাতায় দস্তখত করিয়ে নেয়। রহমানের সেই আচরণ সামাদের মনকে শান্তি দিতে পারে না। তাই প্রতিটা মুহূর্ত নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে সামাদ। একদিকে ধার নেওয়া অর্থ এবং অন্যদিকে সামাদের জাহাজি জীবনচক্রের নারী-

কামুকতার স্বরূপ যদি রহমানের মাধ্যমে সালিমার পরিবারের সকলে জানতে পারে - তাহলে সালিমা-সামাদের বিবাহ-বিচ্ছেদের আসন্ন সংশয়ের মেঘ থেকে বৃষ্টি বরবে অঝোরে। জীবন-যৌবন-ধনমান ভাসিয়ে দেবে অবিশ্বাসের সেই সামান্য কারণে। প্রায় প্রতিদিনই রহমানের আচরণের রহস্যময় অসঙ্গতি মানতে পারে না জাহাজি সামাদ। তাই একদিন জাহাজে ঘটল তার চরম ব্যক্তি-দ্বন্দ্বের বিপর্যয়।

গ্রাম থেকে আসা চিঠির সূত্রে সামাদ জানতে পারে জাহাজি রহমানের ধূর্তামির কথা, -

“দেশে রহমান টিভাল সালিমার বাপকে জানিয়েছে সামাদ তালাকনামা করেছে। আর সেই তালাকনামা রহমানের কাছে আছে।”^{২১}

মিথ্যা তথ্যকতা করে রহমান সামাদ ও তার পরিজনদের কাছ থেকে অর্থ, সম্পত্তি, সর্বস্ব হাতিয়ে নিতে চায়। সেই প্রতারণিত আচরণ মানতে পারেনি নিঃসঙ্গ সামাদ। কারণ ডেক-এর উপর ব’সে কর্মহীন চিন্তায় জাহাজিদের মনে উঠে আসে নানান সংকট আর অবিশ্বাস। তাই এক নিশীথ অন্ধকারে বিক্ষুব্ধ সামাদ জাহাজে একাকী রহমানকে কাছে পেলে অনেক জাহাজিই দেখে রণোন্মত্ত সামাদের তেজ ও ক্ষমতা প্রদর্শনের প্রত্যক্ষ ঝগড়া-বিসম্বাদ -

“ডেকের উপর এবার লড়াইটা জমে উঠছে। দিন দিন এই জাহাজে বড় টিভাল রহমানের সঙ্গে সাধারণ ডেক জাহাজি সামাদের যে আক্রোশ ছিল, জাহাজ ছাড়ার আগে যেন সেই আক্রোশ তাণ্ডব হয়ে দেখা দিয়েছে। ...জাহাজীরা ভাবছিল, দীর্ঘদিনের সমুদ্রযাত্রা সামাদকে পাগল করে দিয়েছে অথবা অন্য কিছু...”^{২২}

এভাবে সমুদ্রের নোনতা হাওয়া আর মনের মধ্যে জমে থাকা পরিবার-পরিজনদের কাছে না পাওয়ার যন্ত্রণা ও দীর্ঘ সমুদ্র-জীবনের অবসাদ-গ্রন্থ জাহাজি মানুষগুলি পাগলপারা হয়ে ওঠে। আচরণের ভালো-মন্দের গুণাগুণ বা বাদ-বিচার করতে তখন তারা অক্ষম। সমুদ্রযাত্রায় এ এক অভ্যস্ত নিত্য-নৈমিত্তিক এবং প্রাসঙ্গিক ঘটনা। চেনা-চেনা মুখের সারিতেও দীর্ঘ প্রবাস-জীবন কাটানো জাহাজিরা জীবনের আনন্দ অনুভব করতে পারে না; তাই তাদের কেবলই মনে হয়, জীবিত-জীবন নয়, বরং মৃত্যুর প্রশান্তিই তাদের জীবনে মহৌষধির মতো কাজ করে। করুণঘন এই দৃশ্যগুলিতে আপন ভাগ্যের পরিহাসকেই অবলীলায় গ্রহণ করেছে জাহাজিরা। তাই জাহাজিদের কেবলই মনে হয়, -

“কি এক নিদারুণ রহস্য জড়িয়ে আছে গোটা ব্যাপারটিতে।”^{২৩}

আবার কখনও দেখা যায়, কাগান-সারেঙদের মতো অভিজ্ঞ জাহাজি মানুষেরা জাহাজের ডেক-এ ঘটে যাওয়া নানান ঘটনার সাক্ষীগোপাল হয়ে থাকতে। চরম মানসিক অবসাদ থেকে আত্মহত্যা কিংবা একে-অপরকে সন্দেহপ্রবণ জ্ঞান করে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে জাগিয়ে তোলে। কিংবা যদি দেখতে পাওয়া যায় এমন ঘটনা, যেখানে দীর্ঘ প্রবাসী সমুদ্র-সফর শেষে জাহাজি মানুষগুলি দেশে ফিরছে। শত আনন্দের রোশনাই তখন তাদের পরিবার-জীবনের কাছে। কোনো জাহাজি বিভিন্ন বন্দর থেকে কিনে আনা নানান বৈদেশিক সামগ্রী নিয়ে পরিবারদের জন্য চরম উৎকর্ষায় অপেক্ষার প্রহর গুনছে, আর ঠিক তখনই ঘটে গিয়েছে বেদনাভারাতুর কোনো বেদনাদায়ক মৃত্যুর ঘটনা -

“জাহাজীরা পেটি বদনা ঠিক করে ফেলছে, বন্দর এলেই নেমে পড়বে - বিবির জন্য সওদা, খুসবু আতর, মরিসাসের কাঠের হাতি, বুনস সাইরিসের কস্বল শীতের দিনের মনোরম কামিজ - এমন সময় কিনা এক জাহাজী মাস্তলে ওঠে, রঙ লাগাতে গিয়ে পাখি হয়ে উড়ান দিল মাস্তল থেকে। তারপর নিচে, একেবারে নিচে ফল্কার ভিতর মানুষটা ছাতু হয়ে গেল।”^{২৪}

এমন অনেক ঘটনা লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে মনকে ব্যাথা-দীর্ণ করে তোলে। খণ্ড-বিচ্ছিন্ন এমন ছবির কোলাজ দিয়েই সমুদ্র-জীবনের স্মৃতি জাগিয়ে রাখতে চান সমুদ্রপ্রেমী লেখক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে জাহাজের ডেক কিংবা জাহাজি মানুষগুলি ফেলে আসা স্মৃতিকে স্মরণ ক’রে নতুন বন্দরের অপেক্ষা করতে থাকে। বেদনায় আক্রান্ত জাহাজি মনগুলি থেকে লেখক অন্বেষণ করেছেন জাহাজ ও সমুদ্র-জনমানসের মনস্তত্ত্ব এবং বন্দর-সংস্কৃতির চালচিত্র। সমাগত মধ্যরাত্রে একাকী জাহাজে জ্যোৎস্নার বিচ্ছুরণ, স্বপ্নমধুর জীবনের কথা নিয়ে মানুষগুলি ডেক-রেলিংয়ের

কিনারায় এসে দাঁড়ায়। চতুর্পার্শ্বে তখন তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সামুদ্রিক গর্জন, আবার পরমুহূর্তেই চির প্রশান্তিময় দরিয়ার ছবি। বৈপরীত্যের এমন চালচিত্রে দাঁড়িয়ে নাবিক সুমন তখনও দুই হাত বাড়িয়ে মারিয়ার মনকে স্পর্শ করার অপেক্ষায়, -

“একা একা দাঁড়িয়ে সাদা জ্যোৎস্নায় বার বার অসীম সমুদ্র আকাশ, এবং নক্ষত্র দেখতে দেখতে কেমন পাগলের মতো হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। ... সে যেন আকাশের কোন পরিচিত নক্ষত্র দেখতে দেখতে আকুল। ...রাত গভীর হয়। ...সুমন আর স্থির থাকতে পারে না। ভিতরে ভিতরে সব কেমন গোলমাল হয়ে যায়।”^{২৫}

এইভাবে এক-একটি ঘটনার হাত ধরে সমুদ্র-নাবিকেরা আপন মনের মণিকোঠায় সাজিয়ে রাখে ফেলে আসা স্মৃতিমধুর অতীতগুলিকে। বন্দরে-বন্দরে অচেনা মুখের ভিড়ে লুকিয়ে থাকা কিছু মুখ তখন আলো পেতে চায়, ভাষা পেতে চায়, কাহিনি হয়ে উঠতে চায় কল্প-পার্থিবের মানসভূমিতে। মা ভারোদীর শত রক্তভ চোখের শাসানিকেও উপেক্ষা ও অতিক্রম করে মারিয়া পূর্ণ যৌবনে সন্ন্যাসিনী-বেশে ফিরে আসে বাংলায়; আর বঙ্গ-আর্তজনের সেবার অন্তরালে বাংলাদেশের প্রত্যন্তরে ‘সুমন’ নামক এক ‘অলৌকিক মানুষ’কে অনুসন্ধানের সাধনা করে চলে। আধুনিক কবি অমিয় চক্রবর্তী তাঁর কাব্যের মধ্যে সেই সত্যপ্রকাশেও কুণ্ঠিত নন। ‘সংগতি’ কবিতায় তিনি বলেছেন -

“তোমার সৃষ্টি, আমার সৃষ্টি, তার সৃষ্টির মাঝে
যত কিছু সুর, যা-কিছু বেসুর বাজে
মেলাবেন।”^{২৬}

শিকড়ের সন্ধানে সুমনের ‘বিদেশিনী’ মারিয়ার ভারতবর্ষের আসমুদ্র-হিমাচলে অন্বেষণ এবং হারানোর-বেদনার মাঝে লুকিয়ে থাকে তার সেই প্রিয়-প্রাণস্পন্দ মানুষটি। এভাবেই উপন্যাসটি সমকালীনতায় ব্যক্তিসংকটের সমুদ্র জীবনচেতনার প্রকোষ্ঠে যেন মানবমনের অতলে আলো ফেলে যায়।

Reference:

১. ‘শুভশ্রী’, বন্দরে বন্দরে : সমুদ্রজীবনের ধ্রুপদী সংগীত, শুভেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিনব সৃষ্টি : বাংলা কথাসাহিত্যে ৪৯ বর্ষ। (১৪১৭ : ২০১০-২০১১, Reg No. WBBEN/2008/24259), পৃ. ২৮১
২. মজুমদার, সমরেশ, কথা কইতে বাধে, (কলকাতা : আরুণি পাবলিকেশন, প্রথম সংস্করণ আগস্ট ২০০০), পৃ. ৬৯
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন, ‘ভূমিকা’ : হীরেন চট্টোপাধ্যায়, ‘উপন্যাস সমগ্র’ (সপ্তম খণ্ড), (কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৫
৪. দে, অমর (সম্পা.), অমর দে, সাক্ষাৎকার, ‘আত্মকথা : অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়’, ‘গল্পসরগি’, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা, (বিংশতি বর্ষ : বার্ষিক সংকলন ১৪২২ বঙ্গাব্দ/২০১৬), পৃ. ৩০৮
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন, বিদেশিনী, ‘উপন্যাস সমগ্র’ (সপ্তম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন, বিদেশিনী, ‘উপন্যাস সমগ্র’ (সপ্তম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন, বিদেশিনী, ‘উপন্যাস সমগ্র’ (সপ্তম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন, বিদেশিনী, ‘উপন্যাস সমগ্র’ (সপ্তম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন, বিদেশিনী, ‘উপন্যাস সমগ্র’ (সপ্তম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ২০
১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন, বিদেশিনী, ‘উপন্যাস সমগ্র’ (সপ্তম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪
১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন, বিদেশিনী, ‘উপন্যাস সমগ্র’ (সপ্তম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬
১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন, বিদেশিনী, ‘উপন্যাস সমগ্র’ (সপ্তম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩
১৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন, বিদেশিনী, ‘উপন্যাস সমগ্র’ (সপ্তম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩
১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন, বিদেশিনী, ‘উপন্যাস সমগ্র’ (সপ্তম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪

১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন, বিদেশিনী, 'উপন্যাস সমগ্র' (সপ্তম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯
১৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন, বিদেশিনী, 'উপন্যাস সমগ্র' (সপ্তম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১
১৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন, বিদেশিনী, 'উপন্যাস সমগ্র' (সপ্তম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১
১৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন, বিদেশিনী, 'উপন্যাস সমগ্র' (সপ্তম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫
১৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন, বিদেশিনী, 'উপন্যাস সমগ্র' (সপ্তম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮
২০. দে, অমর, (সম্পা.), অমর দে, সাক্ষাৎকার, 'আত্মকথা : অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়', গল্পসরপি, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা, (বিংশতি বর্ষ : বার্ষিক সংকলন ১৪২২ বঙ্গাব্দ/ ২০১৬), পৃ. ৩০৯
২১. বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন, বিদেশিনী, 'উপন্যাস সমগ্র' (সপ্তম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮
২২. বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন, বিদেশিনী, 'উপন্যাস সমগ্র' (সপ্তম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬
২৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন, বিদেশিনী, 'উপন্যাস সমগ্র' (সপ্তম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭
২৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন, বিদেশিনী, 'উপন্যাস সমগ্র' (সপ্তম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭
২৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন, বিদেশিনী, 'উপন্যাস সমগ্র' (সপ্তম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩
২৬. চট্টোপাধ্যায়, অরিন্দম, (সম্পা.), সংগতি : অমিয় চক্রবর্তী, আধুনিক কবিতা সঞ্চয়ন, (রাজবাটি, বর্ধমান : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, জুলাই, ২০০৯), পৃ. ১২৬